মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ

মুসলিম জামা'য়াহর উচিত— চলমান মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে তাদের প্রতিটি সদস্যকে দুর্গবদ্ধ ও নিরাপদ রাখা। দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধেও এধরণের যুদ্ধ চলমান রয়েছে। আর এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে— সৈন্য, শায়েখ, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ও সরকার, নানা সংগঠন, বিশ্বাসঘাতক ও পশ্চাদপসরণকারী, গবেষণা কেন্দ্র, গোয়েন্দা সংস্থা, এবং আলেম নামধারী ভাড়াটে এজেন্টরা। এই তালিকায় আরো অনেকে আছে, যাদেরকে আপনারা চিনেন না, তবে আল্লাহ চিনেন।

যারা মনে করে এই যুদ্ধ কেবল ময়দানের গোলাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারা চরম ভুল করে। কেননা এই যুদ্ধের শিকড় আরও গভীরে, এর বিস্তৃতি আরো বেশি। সামরিক লড়াই হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রসমূহের একটি ক্ষেত্র। এই যুদ্ধ এতই ভয়াবহ যে, কোন বুলেট খরচ করা ছাড়া সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধাকেও শেষ করে দিতে পারে, যদি সে ঈমানের অস্ত্রে সজ্জিত না থাকে।

মনস্তাত্ত্বিক বা মানসিক যুদ্ধ মানে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রের গোলাগুলি নয়; বরং এটি এমন এক সুপরিকল্পিত প্রচারণা ও প্রভাব বিস্তারকারী পদ্ধতি, যার লক্ষ্য হলো, বিরোধিপক্ষের চিন্তা-চেতনাকে বদলে ফেলা, তাকে পুরনো অবস্থান থেকে সরিয়ে নতুন অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য করা, কিংবা অন্ততপক্ষে তাদের মনে সন্দেহের বীজ বপন করে দেওয়া। এর জন্য তারা দীর্ঘ সময় নিয়ে কাজ করতে থাকে, এবং লক্ষ্য পূরণের জন্য ধাপে ধাপে কর্মপদ্ধতি সাজিয়ে নেয়। শত্রুরা আজ যা অর্জন করে, হতে পারে তা পরিপূর্ণ নয়; কিন্তু আগামীকাল সে সেটার উপর ভিত্তি করে আরও অগ্রসর হয়, যতক্ষণ না প্রতিপক্ষের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়।

মুসলিমদের মনে রাখতে হবে, এটা আত্মসমর্পণের পথ বেছে নেয়। সে নিজেকে আত্মতুষ্ট করার জন্য এই যুদ্ধে আপস করে ফেলে। আর যে ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে সরে যায় বা ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, সে তখন এমন ব্যাখ্যা খোঁজে যা তাকে ভুলমুক্ত প্রমাণ করবে, যেন সে-ই ঠিক আর অন্যরাই ভুল। এইভাবে সে নিজের বিচ্যুতি ও পশ্চাদপসরণকে যৌক্তিকতা দিতে থাকে—অন্যদের কাঁধে দায় চাপিয়ে। এর ফলাফল হয় ভয়াবহ। এই ব্যক্তি তখন নিজের অজান্তেই শত্রুর পক্ষে একটি অস্ত্র হয়ে ওঠে। শত্রু তার এই মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তাকে তার সৈনিক হিসেবে খাটাতে থাকে, অথচ সে বুঝতেই পারে না—সে এখন মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের এক অদৃশ্য সৈনিক।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের কার্যকর কৌশলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—"পুনরাবৃত্তি।" শত্রু বারবার একই বার্তা ছড়ায়, একই প্রচার চালায়, এক মুহূর্তের জন্যও ক্লান্ত হয় না। বরং তাদের বাজেট, প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয়সমূহ এই প্রচারণার সেবায় নিয়োজিত থাকে। এই পুনরাবৃত্তির

কোন অপরিকল্পিত বা উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধ নয়। বরং শত্রুরা এ যুদ্ধে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। আপনি হয়তো তার কৌশল ধরতে পারবেন না; কিন্তু এটা নিশ্চিত বুঝতে পারবেন যে, তার পদক্ষেপগুলো একটা ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে, এবং এই অপপ্রচার, বিভ্রান্তি ও মানসিক চাপের ধারা সফল না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে। আর ব্যর্থ হলে তারা পরিকল্পনা পাল্টায়, কিংবা নতুন কৌশল নিয়ে আসে। এ যুদ্ধটি ইসলাম ও কুফরের চিরন্তন দ্বন্দ্বের সাথে সমন্বিত —যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে বিজয়ী হয় সেই ব্যক্তি, যার অটল ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় সংকল্প রয়েছে। যে তার বিশ্বাসে অটল থাকে, কোনো পরিবর্তন বা বিচ্যুতি ঘটায় না, যদিও তার সংখ্যা কম, সরঞ্জাম অপ্রতুল এবং শারীরিকভাবে দুর্বল হয়। এখানে আত্মার শক্তি দেহের শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করে। তাই ধৈর্যশীল ও দুর্বল ব্যক্তি বিজয় লাভ করে, আর অধৈর্য তাড়াপ্রবণ ব্যক্তি সব ধরনের অস্ত্র ও লৌহ-সামগ্রীতে সুসজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও পরাজিত হয়। এজন্য ইসলাম মুসলিমদের দৈহিক শক্তির আগে আত্মিক গঠন ও ঈমানের দৃঢ়তা অর্জনের গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ, যখন সংখ্যা কমে যায়, সাহায্য অপ্রতুল হয় এবং দেহ দুর্বল হয়ে যায়, তখন আত্মিক শক্তির উপরই নির্ভর করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাগুজে যারা অটল ছিলেন, তাদের দেহ দুর্বল হয়ে পড়লেও সংকল্প দুর্বল হয়নি। ফলে তারা বিজয়ী হয়েছিলেন আত্মার শক্তির মাধ্যমে, দেহের শক্তির মাধ্যমে নয়।

আজকের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ভয়াবহতা এই কারণে আরও মারাত্মক যে, এটি আজ সীমান্ত-বিহীন এক বৈশ্বিক আগ্রাসনে পরিণত হয়েছে। ঘরে ঘরে, মানুষে মানুষে এর ছায়া বিস্তার করছে। এর কাছে আত্মসমর্পণকারী সকলেই চপেটাঘাত খেয়েছে। আর এ কারণেই নবী ﷺ আমাদের সতর্ক করে প্রভাব ক্রমেই মানুষের চেতনায় গেঁথে যায়। এই যুদ্ধে ব্যবহৃত আরেকটি শক্তিশালী অস্ত্র হলো— মানুষের আবেগকে কাজে লাগানো। বাস্তবতা হলো, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে সবচেয়ে দ্রুত পরাজিত হয় সেইসব মানুষ, "যারা আবেগ দ্বারা চালিত"। একটুখানি হাসি তাদের মন কেঁড়ে নেয়, আর এক ফোঁটা চোখের পানি তাদের কাবু করে ফেলে! এখানে বলে রাখা প্রয়োজন—আবেগ আর হৃদয়ের কোমলতা এক নয়। চোখে পানি আসা, আল্লাহর ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠা—এসব হৃদয়ের কোমলতার নিদর্শন, যা একজন মুমিনের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস।

এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকে প্রতিরোধের দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যের ওপর বর্তায়। তবে সবচেয়ে বড় দায়িত্বটি গণমাধ্যমকর্মীদের কাঁধে। তাদের উচিত—এই যুদ্ধের অন্তরালের কৌশল, প্রতারণা ও বিপদের গভীরতা ভালোভাবে বোঝা এবং প্রতিকারের সঠিক কৌশল গ্রহণ করা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, শত্রুর প্রতিটি হাস্যকর প্ররোচনায় প্রতিক্রিয়া দেখাতে

দিয়েছেন যেন আমরা ফিতনার দিকে নিজে থেকে না যাই, তাকিয়ে না থাকি, তার স্বাদ নিতে না চাই। কিন্তু আজ অনেকেই সেই বিপর্যয়ের দরজায় নিজেই কড়া নাড়ে, সন্দেহ-সংশয়ের সব জায়গায় নিজের উপস্থিতি নিশ্চিত করে। অবশেষে প্রশ্ন জাগে—সে কিভাবে রক্ষা পাবে এই ভয়াবহ ধ্বংস থেকে?

এই মানসিক যুদ্ধের একাধিক লক্ষ্য থাকলেও, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো "আত্মিক শক্তি" বা "মনোবল"কে ধ্বংস করা। কেননা এই যুদ্ধের সম্পর্ক মনস্তত্ত্বের সাথে। এখানে শত্রুর মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রতিপক্ষের মনোজগতকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করা, আধ্যাত্মিক শক্তি দুর্বল করা এবং ইচ্ছাশক্তি বিনাশ করার মাধ্যমে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করা এবং শেষ পর্যন্ত তাকে আত্মসমর্পণ বা অন্ততপক্ষে নিরপেক্ষ করা।

সম্ভবত এই যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়ংকর উদ্দেশ্যগুলোর একটি হলো—মুসলিম জামা'আহর ভেতর সন্দেহের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়া, বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দেয়া, যাতে সে ধীরে ধীরে নিজের পথ ও আদর্শে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। শেষমেশ তার মনোজগত ভেঙে ফেলা এবং তার চালচলন ও বিশ্বাস-বোধ পাল্টে দেওয়া।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অন্যতম পরিচিত কৌশল হলো পরিকল্পিত ও পুনরাবৃত্তিমূলক গণমাধ্যম প্রচারণা। এই প্রক্রিয়ায় তারা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ফোকাস করে, হোক সেটা কোন গুজব কিংবা সাজানো নাটক বা অন্য যে কোন মিডিয়া আগ্রাসন। কেননা এধরণের যুদ্ধে অপরিকল্পিত কিংবা নিরপেক্ষ বলতে কিছু নেই। এক্ষেত্রে তারা পূর্ববর্তী ঘটনাবলির উপর নির্ভর করে মিথ্যাগুলিকে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতা হবে। শত্রুর ষড়যন্ত্র নিঃসন্দেহে চতুর ও পরিকল্পিত, কিন্তু তাদের কিছু কাজ এতটাই নির্লজ্জ ও নির্বোধপূর্ণ যে, তাতে সাড়া দিয়ে নিচুস্তরে নেমে যাওয়াটা একধরনের বোকামি। বরং এমন অনেক ইস্যু আছে যেগুলোর সবচেয়ে ভালো প্রতিকার হলো—তাদের অবহেলা করা। এ সম্পর্কে একটি সুপ্রাচীন নীতি হচ্ছে: "মিথ্যাকে পরাজিত করো উপেক্ষার মাধ্যমে।"

ইসলাম বহু আগেই এসব মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ প্রতিরোধের কৌশল দিয়ে রেখেছে। এক্ষেত্রে ইসলাম অনন্য। কেননা ইসলাম যা দিয়েছে অন্য কোনো সভ্যতা কিংবা মতাদর্শে তা নেই। ইসলাম এই প্রতিরোধ গড়ে তোলে ঈমানকে ভিত্তি করে; মুসলিমদেরকে তাকদিরে আস্থা রাখতে শেখায়, অনুপ্রাণিত করে ধৈর্য, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও সাহসের পথে। এই শিক্ষাগুলো নিঃসন্দেহে শক্তিশালী, তবে অসুস্থ হৃদয়ে এসবের কোনো প্রভাব পড়ে না। তাই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রথম শর্ত হলো—হৃদয় থেকে সব সন্দেহ ও

দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে, তারা সত্যের কিছু অংশ প্রচার করে যা উদ্দিষ্ট মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়।

এ যুদ্ধের আরেকটি কৌশল হলো — বিতর্কিত অথবা আপাতদৃষ্টিতে বিতর্কিত ইস্যুগুলো ঘনঘন আলোচনায় তোলা, জনমানসে সেই ইস্যু নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করা, এবং অংশগ্রহণকারীদের এমন ধারণায় বিভ্রান্ত করা যে, তাদের একদল ন্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে আর অন্য দল মিথ্যার। অথচ বাস্তবতা হলো—উভয় পক্ষই শত্রুর কৌশলে পা দিয়ে ফেলেছে এবং পরিণত হয়েছে সেই যুদ্ধের জ্বালানিতে, যার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো—বিভাজন সৃষ্টি ও ঐক্যবিনাশ। অবস্থা এমন জায়গায় গড়ায় যে, উভয় পক্ষই শত্রুর হাতে একেকটি অস্ত্রে পরিণত হয়, যার মাধ্যমে সত্যকেই আঘাত করা হয়—যে সত্য তাদের কারো পক্ষেই সঠিকভাবে চেনা হয়নি।

সম্প্রতি তারা আরেকটি আরেকটি কৌশল আবিষ্কার করেছে। আর তা হলো, "বিকল্প পথ" প্রদর্শন। এই কৌশলে শত্রু এমন একটি মডেল তুলে ধরে যা আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা তাদের স্বার্থের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, "তালেবান" বা "জোলানি" মডেলকে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য পরিকল্পিত প্রচারণা চালানো হয়। এর মাধ্যমে একটি মনস্তাত্ত্বিক বার্তা প্রেরণ করা হয়: "তুমি জিহাদি ও শাসক হিসেবে থাকতে পারো, তবে আমাদের শর্তে!" এই পদ্ধতিতে, ক্রুসেইডাররা জিহাদিদেরকে ব্যবহার করে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে! এখন তারা ইসলামিকদেরকে ব্যবহার করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারছে!

অনেক সময় ব্যক্তি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের মুখে প্রতিরোধের পরিবর্তে কামনার গন্ধ ছেঁটে ফেলো। তবেই সেই মন পবিত্র ও বলিষ্ঠ হবে, শরিয়তের আহ্বানে সাড়া দিবে, এবং সত্যের পথে অবিচল থাকতে পারবে।

সারকথা, একজন মুজাহিদের আত্মিক শক্তিকে যেটি সবচেয়ে বেশি উজ্জীবিত রাখে, তা হলো—তার লক্ষ্য কতটা স্পষ্ট এবং সে লক্ষ্য অর্জনে তার ঈমান কতটা দৃঢ়। আর এই কারণেই আমরা দেখি, যারা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পরাজিত হয়—তারা মূলত তাদের বিশ্বাসের জায়গা থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ে। কেউ হয়তো তার আকিদা বদলে ফেলে, কেউবা তা ত্যাগ করে, কেউবা কেবল তা ধারণ করার সাহসটুকু হারিয়ে ফেলে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, একজন মুজাহিদ কখনো ক্লান্ত হন না, বা কষ্ট অনুভব করেন না। তিনিও ক্লান্তি অনুভব করেন, কষ্ট পান, তবে কখনো দমে যান না, পিছু হটেন না, পথ পরিবর্তন করেন না—যতক্ষণ না বিজয় অর্জিত হয় অথবা শাহাদাতের অমিয় মর্যাদায় তিনি ধন্য হন।